শিক্ষার সাফল্য দৃশ্যমান

রাশেদা কে চৌধূরী

০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৪:৫১
আপডেট: ০৭ নভেম্বর ২০১৯, ১৫:০২

বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন হলো শিক্ষায় কিছু দৃশ্যমান সাফল্য। এই অর্জন এখন সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আফ্রিকা বা অনগ্রসর দেশগুলো যখন শিক্ষায় ছেলেমেয়ের সমতা অর্জনে হিমশিম খাচ্ছে, তখন বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরেই ছেলেমেয়ের সেই সমতা অর্জন করে ফেলেছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, এখন প্রাথমিকে ছাত্রীদের হার প্রায় ৫১ শতাংশ, যা মাধ্যমিকে প্রায় ৫৪ শতাংশ। এটি বিশ্বে নজর কেড়েছে। আশার বিষয়, এই অর্জনের ধারা অব্যাহত আছে। এখন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে।

শিগগিরই আমরা মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা অনেক দূর পথ হেঁটেছি। শিক্ষার অনেক বিষয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ১০ বছর আগেও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা মূলধারায় ছিল না, সেটি মূলত উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইংরেজি মাধ্যম বা কিন্ডারগার্টেনেই কেবল প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। এখন প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পর ২০১০ সালে আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি পেয়েছি। যদিও সেই নীতি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এখনো ধীর। প্রায় এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও একটি পূর্ণাঙ্গ ‘শিক্ষা আইন’ না হওয়া দুঃখজনক। সেই শিক্ষানীতির দিকনির্দেশনার ভিত্তি ছিল আমাদের সংবিধানের মূলমন্ত্রগুলো। সেগুলো সামনে রেখে দুটি বড় দিকনির্দেশনার একটি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের লাগাম টানা এবং দ্বিতীয়ত, সংবিধানের আলোকে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষণীয় হলো, প্রাথমিকের পর মাধ্যমিকেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। ঝরে পড়াও কমছে, যদিও মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার এখনো উদ্বেগজনক। ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিকে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ৩৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ, আর ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ৪০ দশমিক ১৯ শতাংশ। তবে আশার কথা, হারটি কমছে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হারও হ্রাস পেয়ে ১৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১০ সালেও ছিল ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ। এটি অবশ্যই দৃশ্যমান অগ্রগতি। বাল্যবিবাহের হার ও গত চার-পাঁচ বছরে কমে এসেছে, যদিও এই হ্রাসের হার অত্যন্ত ধীর।

শিক্ষার চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে বিপ্লব করে ফেলেছেন এ দেশের অগণিত মানুষ। রাষ্ট্র সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি করেছে, মানুষ এগিয়ে এসেছে। আপামর জনগণ এখন তাদের সন্তানদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অনুযায়ী বাংলাদেশ অঙ্গীকার করেছে এবং সেগুলো অর্জনও করতে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছে। এর অনেকগুলো বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এ-ও আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে ১২ বছর পর্যন্ত ন্যূনতম শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতা। মানুষকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন নয়, জীবন-জীবিকার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হয়। সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়ে কারিগরি শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একধরনের সচেতনতা তৈরি হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। মানুষ এখনো সাধারণ শিক্ষার দিকেই বেশি ঝুঁকছে। সে কারণে অনেক প্রয়াসের পরও এখন পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রায় ১৬ শতাংশ শিক্ষার্থীকে আনা সম্ভব হয়েছে। সরকার ঘোষণা করেছে, ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে কারিগরিতে নিয়ে আসা হবে। সংখ্যার দিক থেকে এখন উচ্চশিক্ষারও প্রসার হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেড় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে নারীর জন্য ৬০ শতাংশ কোটা থাকলেও আমরা সেই সীমারেখা বেশ আগে অতিক্রম করেছি। তবে মাধ্যমিকে শিক্ষক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ নয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এই হার নগণ্য। পেশাগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারী শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসছে। উচ্চশিক্ষার অন্যান্য স্তরেও নারীরা এগিয়েছে। কিন্তু একটি বাস্তবতাও আছে এখানে। শিক্ষার এসব ক্ষেত্রে যারা এ পর্যন্ত উঠে আসছে, বিশেষত নারী, তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত পরিবারের। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পেলেও শেষ পর্যন্ত অনেকে টিকে থাকতে পারে না। এর একটি প্রধান কারণ হলো শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে শিক্ষা ক্রমাগত পণ্য হয়ে উঠছে। ব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে যে যত বেশি বিনিয়োগ করতে পারে, তার সন্তান তত বেশি সুযোগ পায়। এখনো শিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ১২ থেকে ১৪ শতাংশ অথবা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র দুই থেকে আড়াই শতাংশের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষার বাজেট ঘুরপাক খাচ্ছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নিম্নতম! ফলে সরকারের নীতিমালা, এমনকি মহামান্য আদালতের নির্দেশনা সত্ত্বেও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের লাগাম টানা যাচ্ছে না। পারিবারিক বিনিয়োগ বাড়াতে হচ্ছে। সেখানেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে আছে। এ জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরেই ছেলেমেয়ের সমতা অর্জিত হয়েছে। ছবি: হাসান রাজা

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। তারপরও দুঃখজনক হলো, আমরা যাদের শিক্ষার চালিকাশক্তি বলে থাকি, সেই শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য বারবার মাঠে নামতে হয়। তার ফলে আমরা দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষক প্রায়শ পাই না। জীবন চলার জন্য শিক্ষকেরাও টিউশনি ও কোচিংয়ের দিকে ঝোঁকেন। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে শুধু বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করলেই শিক্ষকেরা দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠবেন, তা নয় । কিন্তু শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মানী যদি না দিতে পারি, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করাও যুক্তিসংগত নয়। দক্ষ, নিষ্ঠাবান শিক্ষকের যে অভাব আছে, সেটা তো আমরা প্রায়শ দেখে থাকি। কিছুদিন আগেও গণসাক্ষরতা অভিযানের করা এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে দেখা যায়, মাধ্যমিকের ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার জন্য শিক্ষক সমিতির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র কেনেন। ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ শিক্ষক বলেছেন, বাজার থেকে প্রশ্নপত্র কেনেন! ১০ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। এর আগে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

অধিদপ্তরের একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদনেও দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক শিক্ষক এখনো সৃজনশীল পদ্ধতিতে ঠিকমতো প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারছেন না। প্রাথমিকেও কমবেশি একই চিত্র। ফলে শিক্ষকেরাই যখন এমন গলদঘর্ম হন, তখন স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের সমস্যাটা বেশি হয়। তাই বাস্তবতাকে স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেই হবে। শিক্ষার নিচের স্তরগুলোতে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ভিত্তি শক্ত হলে শিক্ষার ওপরের স্তরে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

যে চ্যালেঞ্জগুলো শিক্ষায় মোকাবিলা করতে হয়, তার মধ্যে একদিকে অর্জন, মানে সবাই আসছে বা চেষ্টা করছে শিক্ষা গ্রহণের। অন্যদিকে এখনো আমরা দুটি জায়গায় বারবার হোঁচট খাচ্ছি। একটি হলো সুবিধাবঞ্চিত, তথাকথিত দরিদ্র বা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং কিছু অনগ্রসর অঞ্চল যেমন চর, হাওর, চা-বাগান এবং ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা বেশি। এমন আরেকটি জনগোষ্ঠী হলো প্রতিবন্ধী। আশ্চর্যজনকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার প্রায় এক দশক পরেও প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা এখনো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় রয়ে গেছে, মূলধারায় নেই! সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এটাকে কল্যাণমূলক হিসেবে দেখছে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু অধিকারভিত্তিক শিক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ‘সবার জন্য শিক্ষা’ সংবিধানের এই জায়গাটি বারবার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে।

শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষা একদিকে আলোকিত প্রজন্ম তৈরি করবে, অন্যদিকে আলোকিত মানুষ হয়ে ওঠার ধারায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। তার জন্য প্রয়োজন যথাযথ কর্মসংস্থান। আমরা তথ্য-উপাত্তে দেখতে পাই, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। হতাশা তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। মাদকের দিকে তাদের আসক্তি বাড়ছে। এমনকি ইদানীং প্রাপ্ত কিছু কিছু তথ্যে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। এটি অশনিসংকেত। আমরা যদি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করি, কিন্তু তাদের জন্য যথাযথ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারি, আয়-রোজগারের সুযোগ করে দিতে না পারি, তাহলে demographic dividend নামক বাংলাদেশের সুবর্ণ সুযোগের যে দরজা এখন খোলা আছে, সেই পথটা আমরা হারিয়ে ফেলব। এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। ছবি: প্রথম আলো

শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতা ও মূল্যবোধেরও একটি বিষয় আছে। এগুলো অর্জিত না হলে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যাবে। তার সঙ্গে নানা ধরনের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হবে। মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার জন্য শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই যে কাজ করে না, তা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশাল জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কিছু মানুষের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা কাম্য নয়। সেটি হলে বৈষম্য বাড়বে, যা আমরা এখন ব্রাজিলে দেখছি, ভারতে দেখছি। এই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকেরা অবগত আছেন কিন্তু আর্থিক খাতের যথাযথ সংস্কার এবং শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি যদি সব মানুষের জীবন-জীবিকায় ইতিবাচক পরিবর্তন না আনে, তাহলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

সব শেষে যে বিষয়টি আজ শুধু জনমনে নয়, নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি করছে, তা হলো শিক্ষার মান। শিক্ষার সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের মান নিয়ে যেমন প্রশ্ন আছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে কি না, সেটি নিয়েও প্রশ্ন আছে। আকাশসংস্কৃতির আগ্রাসন ও তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার–এই দুই ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জকে যদি মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে মানসম্পন্ন শিক্ষার সঙ্গে নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের সমন্বয় করার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, সুনির্দিষ্ট কৌশল, পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং সেই বিনিয়োগের যথাযথ সদ্ব্যবহার।

ইদানীং শিক্ষায় নানা ধরনের দুর্নীতি পুরো শিক্ষাঙ্গনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আবার রাজনৈতিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা কিছু অপরাধী শিক্ষার্থীর জন্য পুরো শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হওয়াটা মোটেও কাম্য নয়। এ জন্য শুধু ছাত্ররাজনীতিকে দায়ী করেই এ থেকে উত্তরণ ঘটবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব কঠোর হাতে এ ধরনের অপরাধীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন, যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারে। আজ এ দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের এটাই প্রত্যাশা। শিক্ষার চাহিদা তৈরিতে এ দেশের সাধারণ মানুষ যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে, তারা আশা করে তাদের সন্তানদের জন্য দক্ষ, নীতিমান শিক্ষক এবং কলুষমুক্ত, শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র তার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

রাশেদা কে চৌধূরী নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান; সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা